সংগঠিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানকে সংস্থাভুক্ত করার মধ্য দিয়ে এই প্রক্রিয়া চলেছে। উপনিবেশগুলোর বিদ্যার পরম্পরার তথা ওই সমাজের পক্ষে অনুকূল সংস্করণগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান। বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে লোকবিদ্যাকে জ্ঞানের শ্রেণীতে শামিল বিষয় নাকচ হয়ে গেছে। এখন আসছে নতুন হামলা। আগে নাকচ ক্ষমতার জোরে। কম্পিউটারের মাধ্যমে সংগঠিত করা হল এক বিশেষজ্ঞতার ভিত্তি প্রদান করা। বৈজ্ঞানিক যতই উদার মনোভাবের হোক না কেন, মেশিন তো মেশিনই থাকবে, তা কখনই মানুষে হবে না। মেশিন ততটাই গ্রহণ করবে যতটা তার মধ্যে বন্দোবস্ত হবে আর সেটাও গতিশূন্য অবস্থাতে করতে হয়। আমাদের তা নাজেহাল করবে। আমাদের বিদ্যাকে তা বিকৃত এবং সঙ্কীর্ণ করে। কিন্তু সেটা আমাদের থেকে ওদের জন্যই সমস্যা, কেননা যতই হবে ততই কম ওরা পাবে।

আমার প্রশ্ন হল লোকবিদ্যা পরম্পরায় বিদ্যার সংগঠনের কোন্ নীতি বস্তুসমূহ রয়েছে, যার জোরে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার উপযোগী স্বদেশী সমাজের ভালোর জন্য সংগঠিত করে নিতে পারি। গান্ধী বলেছিলেন, রামন এবং বোসের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত যদি আমাদের ভাষায় পাওয়া যেত, তাহলে রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো ঘরে সমাদৃত হত— একথা বলে তিনি কী বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন? সঙ্গে ভাষার কী সম্পর্ক? লোকবিদ্যা পরম্পরায় বিদ্যার সংগঠন মানুষে মানুষে সম্বন্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠান বা মেশিন দিয়ে না। লোকবিদ্যার সংগঠন যে সমাজের সঙ্গে একীভূত হয়, সেই সমাজের সংগঠনের অন্য সব বিদ্যার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ তৈরি হওয়া দরকার।

যদি হিন্দুস্থান স্বদেশী সমাজের একশত স্বশাসিত ইউনিটের সঙ্ঘবদ্ধ রূপ হয়, যেখানে এই সামাজিক ইউনিটগুলো লোকবিদ্যা সংগঠনের প্রাথমিক রূপের সঙ্গে মিল খায়, তাহলে প্রত্যেক ইউনিটে একশ কম্পিউটার লোকবিদ্যা পরম্পরার বিকাশ ঘটাতে পারে। এই হিশেব মতো সারা হিন্দুস্থানে দশ হাজার কম্পিউটারই স্বদেশী সমাজব্যবস্থাকে পুষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আপনি বলছেন হিন্দুস্থানে এক কোটি কম্পিউটার দরকার। এতো জবরদস্তির কথা, সমাজকে তছনছ করে দেওয়ার কথা এবং সমাজকে গোলাম বানিয়ে রাখার কথা। আমরা কত কম্পিউটার লাগবে, না লাগবে সে কথা বলছি না, বরং বলতে চাইছি যে লোকবিদ্যা পরম্পরা বিদ্যাকে লোকসমাজে স্থাপন করে। মানুষে মানুষে সুসম্পর্ককে সংগঠিত করার অর্থ সেটাই। মার্কিন সাম্রাজ্যের সাথে পাঞ্জা কষার ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রশ্ন বুনিয়াদী বিষয়। বিদ্যার কী ধরনের সংগঠনের আমরা পক্ষপাতী, তা দিয়েই আমাদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ তৈরি হবে।

কম্পিউটার এবং যোগাযোগের দুনিয়ায় এক কাল্পনিক সংযোগের কথা বলা হয়েছে। এ হল এমন এক সংযোগ, যেখানে তার মানুষেরা (সদস্যরা) কখনও পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি মিলিত হয় না, তারা কেবল যোগাযোগ মাধ্যমেই একে অন্যকে জানে। কম্পিউটার দ্বারা জ্ঞানের সংগঠন এবং মানুষে মানুষে সংগঠনের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যদি এমনতর সংযোগকে কোনও নতুন অর্থে সার্বজনীন দুনিয়ার এক অংশবিশেষ হিশেবে মেনে নিই, তাহলে মানুষ বেঁচে থাকার এমনই একটা ধরন খুঁজে নিয়েছে, যা সাধারণ জীবন থেকে আলাদা। সম্ভবত এটাই হল সংগঠনের সেই ধরন যার মধ্যে নতুন সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণী নিজেকে সংগঠিত করবে। এটাই শয়তানের বর্তমান রূপ। স্পষ্ট আকার নেওয়ার আগেই একে নাস্তানাবুদ করা জরুরি।

মুক্ত সফ্‌টওয়্যার আন্দোলন

শমীক সরকার

প্রাককথন ১

কম্পিউটার কী? এটা এমন একটা যন্ত্র, যাকে একটা নির্দেশাবলী পেশ করে দিলে, সেটি বেশ কিছু কাজ পর পর নিজে থেকেই করে যেতে পারে। সেই কাজ হতে পারে খুব 'মামুলি' কিছু কাজ, যেমন, 'কম্পিউটার' শব্দটা লিখে রাখা। হতে পারে খুব কঠিন একটা কাজ, যেমন, হাজার হাজার যুগপৎ সমীকরণের সমাধান করা। এই কাজগুলি হয় যন্ত্রটির সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) নামক একটি অংশে অবস্থিত কোটি কোটি বিদ্যুৎ প্রবাহী-র মধ্য দিয়ে প্রবাহ হবে কি হবে না, কোনগুলোর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হবে তার উপর ভিত্তি করে। আর এই বিদ্যুৎ প্রবাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের তৈরি নির্দেশতন্ত্র দ্বারা। এই নির্দেশতন্ত্রের পোশাকি নাম 'প্রোগ্রাম' বা 'কোড' বা 'সোর্স কোড'। একটি 'কোড' যদি একটি কাজের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়, তবে তাকে বলে সফ্‌টওয়্যার-এর 'কোড'। এই প্রোগ্রামগুলি যখন চলে তখন মানুষ কম্পিউটার কি-বোর্ড বা মাউস থেকে 'অন্তবর্তী' নির্দেশ দিতে পারে এবং তার মাধ্যমে প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট কাজটির পরবর্তী গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে কম্পিউটার এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের আবিষ্কার এবং ব্যবহার যেমন মানুষের কাজ অনেক কমিয়ে দিয়েছিল, কম্পিউটার সেই ঐতিহ্যেরই এক সার্থক উত্তরসূরী। তিরিশ হাজার যুগপৎ সমীকরণ সমাধান করতে ভাল হিশেব করতে পারে এমন কতজন লোকের কত দিন লাগতে পারে বলে মনে হয়? একটা আধুনিক কম্পিউটারের সেটা করতে সময় লাগবে কয়েক মিনিট। যদি কম্পিউটারটাতে 'কীভাবে সমাধান করতে হবে' এই নির্দেশতন্ত্রটি সরবরাহ করা হয়। শুধু হিশেবের কাজ দিয়েই উদাহরণটি দিলাম। না, হিশেবের কাজ ফেলনা নয়, শুধু 'বৌদ্ধিক কর্ম'-ও নয়। লগারিদম্-এর আবিষ্কর্তা জন নেপিয়ার-এর হিশেব অনুযায়ী তাঁর জীবনের অর্ধেক কর্মক্ষম সময় ব্যয়িত হয়েছে শুধু হিশেব করে! হিশেব করার পুরনো পদ্ধতি হল লগ্ টেবিল দেখে দেখে হিশেব করা। আজ থেকে ৩০০-৩৫০ বছর আগে ইংল্যান্ড জোড়া একটা কুটির শিল্প (বা শিল্প) ছিল লগ টেবিল বানানোর। আর তার জন্য প্রত্যেক শিল্প সংস্থাতে কয়েকজন লোক -এর কাজ ছিল দিন-রাত হিশেব করে যাওয়া। আজকের দিনে ব্যাঙ্ক, রেল, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে কম্পুটার-এর ব্যবহারের ফলে মানুষের কাজ অনেক কমে যাচ্ছে। যার ফলে ঐ সব কাজে নিযুক্ত মানুষদের হয়তো ২ ঘণ্টা করে কাজ করলেই হয়ে যেত। কিন্তু কাজের সময় কমছে না (কখন-ও বা বেড়ে যাচ্ছে)। বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছেন।

প্রাককথন ২

ইন্টারনেট কি? কম্পিউটার-এর হাত ধরেই আসা এক প্রকাণ্ড শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যম। ইন্টারনেট আসলে সারা পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন কম্পিউটার-এর মধ্যে একটি 'নেট-ওয়ার্কিং'। এটি মূলত একটি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া। আবার এই প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল কয়েকটি মূল ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে। ৬০-এর দশকেই, আমেরিকার সামরিক দপ্তর-এর নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে তৈরি 'আর্পানেট' যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে

দিয়েই আজকের ইন্টারনেটের শুভ সূচনা। 'আর্পানেট' যোগাযোগ ব্যবস্থার আশু উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলির মধ্যে যোগাযোগ। যাই হোক, ইন্টারনেট প্রযুক্তির পেছনের মূল ভাবনা-গুলির একটা দার্শনিক, আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক মূল্য আছে। ভাবনাগুলি হল :

ক) এটি এমন একটি যোগাযোগের মাধ্যম হবে যেখানে কোনো কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বা Central authority (যোগাযোগটি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য) থাকবে না। যোগাযোগের প্রতিটি বিন্দু হবে সম-পরিমাণ ক্ষমতাশালী।

খ) যোগাযোগের প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে যোগাযোগ হবে সরাসরি অর্থাৎ, কোনো বিন্দুতে পৌঁছতে গেলে অন্য কোনো বিন্দুর মাধ্যমে যেতে হবে না। তাই কোনো একটি বিন্দু যদি অচল হয়ে যায়, তাহলেও বাকি নেটওয়ার্কটির বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না।

গ) ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে যোগাযোগে বেশি সময় লাগবে না।

পাঠক, শুরুতে 'নেট-ওয়ার্কিং' নামক যে নতুন যোগাযোগ পদ্ধতির কথা শুনেছিলাম, তা আর কিছুই নয়, এই মূল ভাবনার উপর দাঁড়ানো যোগাযোগ পদ্ধতি। কম্পিউটার নামক মেশিনটিকে মানুষের আজ্ঞাবহ করে তোলার জন্য প্রয়োজন হয় নির্দেশতন্ত্রের, তা আমরা আগেই জেনেছি। এই নির্দেশতন্ত্র বা কোড লেখা হত, প্রথম দিকে, মেশিন-বোধগম্য ভাষায়। পরিভাষায় একে বলা হয় নিম্নতম মানের ভাষা। পরে এই ভাষার উন্নতি হয়। মানে, নির্দেশতন্ত্রটি মনুষ্য-বোধগম্য ভাষায় লেখা হয়। তারপর অন্তর্বর্তী একটি 'কোড' বা প্রোগ্রাম ঐ মনুষ্যবোধগম্য ভাষায় লেখা নির্দেশগুলি মেশিনবোধ্য ভাষায় পরিবর্তন করে। একটি সফ্টওয়ার এর সফ্টওয়ার 'কোড' হল মনুষ্যবোধ্য ভাষায় লেখা নির্দেশতন্ত্র। আর তার মেশিনবোধ্য ভাষায় পরিবর্তিত রূপটির নামই হল সফ্টওয়ার। 'কোড' লেখার মনুষ্যবোধ্য ভাষাগুলির নাম উঁচু মানের ভাষা। যে অন্তর্বর্তী 'কোড' টি মনুষ্যবোধ্য ভাষার কোডকে মেশিনবোধ্য ভাষায় পরিবর্তন করে তার নাম 'কম্পাইলার'। কম্পাইলার কাজটি করে দুটো স্তরে। প্রথম স্তরে নির্দেশতন্ত্রটি বাইনারি ভাষায় লেখা হয়। এই বাইনারি ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম হল প্রাক্-মেশিনবোধ্য ভাষায় প্রোগ্রাম। যা মানুষ অনেক চেষ্টা করলে বুঝতে পারে। বাইনারি ভাষা মানে বেশ কিছু 'শূন্য' এবং 'এক' পাশাপাশি লেখা। ধরে নেওয়া যেতে পারে, শূন্য মানে একটি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ না হওয়া, আর এক মানে সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ হওয়া। মেশিন-এর মধ্যের শতকোটি সেমিকণ্ডাক্টর (বা বিদ্যুৎপ্রবাহী) এই নির্দেশ সমষ্টি অনুসরণ করে।

একটি কোড লেখা, অর্থাৎ, মনুষ্যবোধগম্য ভাষায় একটি নির্দেশতন্ত্র তৈরি করা যথেষ্ট মুন্সিয়ানা এবং দক্ষতা (Expertise) দাবি করে। এই কোড লেখার দুটি অংশ আছে। প্রথমতঃ নির্দেশতন্ত্রটির যুক্তিপ্রকরণ বা Logic তৈরি করা। এই যুক্তি প্রকরণ এর নাম অ্যালগরিদ্‌ম্। দ্বিতীয়তঃ এই যুক্তি প্রকরণটিকে মনুষ্যবোধ্য কোনো একটি ভাষায় লেখা। প্রসঙ্গত মনুষ্যবোধ্য কোনো ভাষা মানে চলতি কোনো ভাষা (বাংলা, ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ...) নয়, তৈরি করা ভাষা। এরকম কয়েকটি প্রোগ্রামিং-এর ভাষা সি, ফোরট্র্যান,পাস্কাল, পাইথন,পার্ল প্রভৃতি।

প্রথম দিকে কম্পিউটার দেখতে এমন ছোটোখাটো কিছু ছিল না। বাড়িতে বাড়িতেও পাওয়া যেত না। ছিল না এত 'সস্তা'-ও। তখন IBM প্রভৃতি কয়েকটি কোম্পানি মেশিন (বা পরিভাষায় হার্ডওয়র) বানাত। অল্প কিছু মেশিন বানানো হত। মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং কিছু কিছু শিল্পসংস্থার জন্য। প্রতিটি আলাদা আলাদা মেশিন প্রাথমিকভাবে চালানোর জন্য প্রয়োজন হত একটি জটিল সফ্টওয়ার। পরিভাষায় যার নাম অপারেটিং সিস্টেম। এই অপারেটিং সিস্টেম ছিল মেশিন সাপেক্ষ। তারপর ভাবনা-চিন্তা শুরু হল, এমন কোনো অপারেটিং সিস্টেম বানানো যায় কিনা যা প্রায় অবিকৃত অবস্থায় একাধিক মেশিনকে সচল রাখতে পারে। এই ধরনের আদি মেশিন নিরপেক্ষ অপারেটিং সিস্টেমের নাম মিনিক্স। সময়ের সাথে সাথে হার্ডওয়ার বদলাচ্ছিল, উন্নত হচ্ছিল, ছোটো হচ্ছিল। আর বিশেষজ্ঞদের হাতে বদলাচ্ছিল অপারেটিং সিস্টেম। এই সব কাজগুলি হত মূলত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলিতে। শুধু অপারেটিং সিস্টেম নয়, আরো অন্যান্য সফ্টওয়ার তৈরির প্রক্রিয়াও চলতো সেখানে। মিনিক্স-এর থেকেও উন্নত, মিনিক্স থেকেই তৈরি একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়েছিল বেল ল্যাবরেটরিতে। স্পনসর করেছিল AT & T— এই নতুন আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমের নাম ইউনিক্স। ইউনিক্স প্রথমে লেখা হয়েছিল নীচু মানের ভাষায় বা মেশিনবোধ্য ভাষায়। পরে লেখা হয় মনুষ্যবোধ্য একটি ভাষায়, 'সি'-তে। ফলে ইউনিক্স-এর কোড অনেক সহজবোধ্য হয়ে যায় এবং 'সি' জানে এরকম যে কেউ ইউনিক্স-এর কোড নিজের ইচ্ছে মতো বদলে 'কাস্টোমাইজ' করে নিতে সক্ষম। সেই সময় আমেরিকার বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বা কম্পিউটার সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্রে মেশিনের অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ইউনিক্স ব্যবহার শুরু হয়ে গেছিল। প্রায় প্রতিটি গবেষণা কেন্দ্রই ইউনিক্সের কোড কিছুটা বদলে নিজেদের দরকার মতো রূপ প্রদান করতো অপারেটিং সিস্টেমটির।

বিভিন্ন সফ্টওয়ার তৈরির প্রক্রিয়ায় গবেষণাগারগুলিতে যারা যুক্ত ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে শুধুই প্রোগ্রাম 'লিখত' না। চেষ্টা করত সব থেকে ভাল পন্থায় প্রোগ্রামটি লেখার। এখানে মুন্সিয়ানার প্রশ্ন আছে। এবং বৌদ্ধিক ক্ষমতার। স্নান, ঠিক সময়ে খাওয়া, জামা কাপড় কাচা, ঘুম প্রভৃতি 'তুচ্ছ' কাজের প্রতি উদাসীন এই সব প্রোগ্রামারদের অনেকের কাছেই প্রোগ্রামিং শুধু অন্নসংস্থানের উপায় ছিল না। এইসব উচ্চস্তরের দক্ষতার এবং মুন্সিয়ানার কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এদের প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার। এবং এই সহযোগিতা বোধ-ও ছিল প্রবল। এদের মধ্যে কেউ যদি কোনো একটি সফ্টওয়ার-এ কিছু বদল আনতে চাইত তাহলে প্রথমেই সে সফ্টওয়ার-টির কোডটি চেয়ে নিত যে বা যারা লিখেছে তাদের কাছ থেকে। অনেক ক্ষেত্রেই সফ্টওয়ারটির সাথেই দেওয়া থাকত কোডটিও। মানে, মেশিনবোধ্য ভাষায় লেখা নির্দেশতন্ত্রটির সাথেই থাকত মনুষ্যবোধ্য ভাষায় লেখা রূপটি। তারপর সে কোডটি-কে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে নিত। কখনো কখনো উন্নততর করে ফেলত সফ্টওয়ারটিকে। তারপর উন্নততর কোডটির একটি কপি দিয়ে আসত মূল লেখককে। এই 'কোড' চাইলে-ই দেওয়া আর পরিবর্তিত 'কোড'-এর কপি ফিরিয়ে দেওয়া—এটি একটি পারস্পরিক বোঝাপড়া, একটি সংস্কৃতি, একটি মূল্যবোধ। এই ধরনের প্রোগ্রামারদের একটা নাম ছিল, আছে, হ্যাকার। বোধহয় নিজেদেরই দেওয়া।

পাঠক খেয়াল করুন, এই হ্যাকার-রা যেন একটি সমাজ বা কৌম। সেই কৌমের প্রতিটি মৌল হল এক একজন হ্যাকার। তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই তারা একধরনের বোঝাপড়া বা মূল্যবোধ নিয়ে চলত। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'— ছোট্টবেলায় শেখা, খুব সহজ এই কথাটা আমরা যত বড়ো হয়েছি, ভুলতে ভুলতে গেছি। হয়তো তার অংশ অংশ কিছু এখনও নিয়ে চলি, খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে, সেই কথাটা— হ্যাকার কৌম বা কম্যুনিটির মূলমন্ত্র। এমনি এমনি নয়, প্রয়োজনের তাগিদেই। এই কম্যুনিটিটাকে খাটো চোখে দেখবেন না। আজকে আমরা যে

সফ্টওয়ার সমুদ্রে হাবুডুবু খাই, মাসিক জমা-খরচের হিশেব থেকে কার্টুন চিত্র বানানো— মনে হয় যেন সমস্ত কাজই এখন সফ্টওয়ার-এ করা যায় অসাধারণ দ্রুততায়, এই সমুদ্রের নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ অংশ প্রাথমিক ভাবে হ্যাকারদেরই তৈরি। এই হ্যাকার এবং প্রাক-হ্যাকারদের সৃষ্টি ডাকাতি করেই পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়ে গেল বিল্ গেট্স্, চুরি করে তৈরি হল বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মাইক্রোসফ্ট, সান, আইবিএম, জেরক্স, টি.সি.এম. প্রভৃতিদের কম্পিউটার সাম্রাজ্য। আর খুচরো হাত সাফাই করে (থুড়ি, কপি পেস্ট করে) সোনার চাঁদ হয়ে উঠল তৃতীয় বিশ্বের হাজার হাজার সফ্টওয়ার প্রফেশনাল' (সবাই নয়)।

এই হ্যাকাররা নিজেদের সংস্কৃতিতে এতটাই দৃঢ় ছিল যে, এরা প্রতিষ্ঠানের বিধিনিষেধও উপেক্ষা করত, ভাঙত। রাতে বন্ধ ল্যাবের তালা খুলে ঢুকে পড়ত। পাসওয়ার্ড বা ইলেকট্রনিক তালাচাবি দিয়ে সুরক্ষিত রাখা কম্পিউটার-এর পাসওয়ার্ড ভাঙত। শুরু করত কাজ। এদের কার্যকারিতার কথা মাথায় রেখেই কর্তৃপক্ষও খুব একটা চটাত না এদের। আক্ষরিক অর্থেই কম্পিউটার দুনিয়া তখন ছিল পদ্মবন। মত্তহস্তীর পদার্পন হয়নি তখনো এখানে।

বড়ো বড়ো মেশিন তৈরির কোম্পানিগুলির কাছে তখনও ছিল হার্ডওয়ারই মূলতঃ বাণিজ্যিক প্রোডাক্ট। সফ্টওয়ার ছিল হার্ডওয়ার এর সাথে দেওয়া 'ফালতু' প্রোডাক্ট। হার্ডওয়ার এর 'প্যাকেজিং'। ক্রমে ক্রমে তারা বুঝতে পারছিল, সফ্টওয়ারও একটি উল্লেখযোগ্য পণ্য হতে পারে। উঠে আসছিল নতুন নতুন কোম্পানি (যেমন মাইক্রোসফ্ট প্রভৃতি) যাদের প্রধান পণ্যই হল সফ্টওয়ার। আস্তে আস্তে কোম্পানিগুলি সফট্ওয়ার-এর সাথে 'কোড'-ও দিয়ে দেওয়া বন্ধ করে দিল। চাইলেও দিত না। সফ্টওয়ারগুলির দাম ঠিক হল অনেক চড়া। ইউনিক্স এর স্বত্ব দাবি করে বসল AT & T। দ্রুতই এটা হয়ে দাঁড়াল রেওয়াজ। আস্তে আস্তে সফ্টয়ারগুলিতে 'টাইম-বম্ব' ব্যবস্থা বা অন্যান্য ব্যবস্থা জুড়ে দেওয়া হয়, যার ফলে হয় সফ্টওয়ারটি একটি নির্দিষ্ট সময় পরে আর কাজ করবে না, বা সফ্টওয়ারটি কপি করে অন্য মেশিনে চালানো যাবে না। ক্রমে এটাই হয়ে দাঁড়ায় আইন। সফ্টওয়ারকে সাজানো হয় চড়া দামের পরিষেবা রূপে। যেমন, বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর মোছার জন্য কাজের লোক নিয়োগ করা হয়, তেমনই আমি-আপনি, সাধারণ গ্রাহক এক বা দু'বছর-এর জন্য কোনো একটি সফ্টওয়ার ব্যবহার-এর 'লাইসেন্স'পাই। 'স্বল্প' দামের পারসোনাল কম্পিউটার (PC) আসার পর এই ট্রেন্ড আরো বাড়ে। বৈধতা পেতে থাকে। ক্রমে 'হ্যাকার' শব্দের মানে হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষিত বুদ্ধিমান চোর, বা ডাকাত— যারা 'ভাইরাস' ছাড়ে ইন্টারনেটে, যারা ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে ব্যাহত করে। কম্পিউটার জগতে বৈধতা, ন্যায্যতা, নৈতিকতা পুনঃসংজ্ঞায়িত হয়।

পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল কোনো পাঠকের কাছে এই ইতিহাস কতদিন আগের বলে মনে হচ্ছে? শুনবেন? গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে আধুনিক প্রজন্মের কম্পিউটার-এর যাত্রা শুরু। ১৯৮৩ সালে প্রথম PC বাজারে আসে। IBM-এর PC। হ্যাকার কমিউনিটিও ছোটো হতে থাকে ৯০-এর দশকের গোড়া থেকেই। আর প্রায় একই সাথে শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইও।

হ্যাঁ, আন্দোলন। ঘুরে দাঁড়ানোর আন্দোলন। এর স্থপতির নাম রিচার্ড এম. স্টলম্যান। অঙ্কের 'বিস্ময় বালক'। হার্ভার্ড-এ পড়াশুনো করা স্টলম্যান। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্স্ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে কৃত্রিমবুদ্ধি গবেষণাগারে (AI lab) ঢুকেছিলেন গবেষণাকর্মী হিসেবে। তারপর হ্যাকার হয়ে যাওয়া। তারপর হ্যাকার কমুনিটির সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় কুক্ষীগত হওয়া থেকে বাঁচাতে শুরু হল লড়াই। লড়াই-এর প্রথম ধাপ? 'নিজেরাই একটা অপারেটিং সিস্টেম বানানো'। লড়াই-এর স্পিরিট-এর সাথে খাপ খেয়ে যায় বৌদ্ধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা। অপারেটিং সিস্টেম কেন? কারণ, কম্পিউটার-এর যন্ত্রাংশকে সচল এবং আজ্ঞাবহ করে তোলার প্রাথমিক নির্দেশতন্ত্র ওটাই। একটা নামও ঠিক হল এই ভাবী অপারেটিং সিস্টেমের। GNU বা গ্নু। এটি একই সাথে নাম এবং নামের সংক্ষিপ্ত রূপ। পুরো নাম GNU's Not Unix। ঠিক বললাম কি? না, না, (GNU's Not Unix)'s Not Unix। তবুও ঠিক হল না। {(GNU's Not Unix)'s Not Unix}'s Not Unix... আসলে এই ধরনের অন্তহীন নাম প্রদান করা হ্যাকারদের একটা প্রিয় চ্যাংড়ামি।

যাই হোক। এবার ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারটায় ফিরে আসা যাক। ঘুরে দাঁড়ানো মানে হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়ানো নয়। আবার ব্যক্তি রিচার্ড স্টলম্যানের কাছে এটা ঘুরে দাঁড়ানোও নয়। তাঁর কাছে এটা, তিনি যে পথে চলতে অভ্যস্ত, সে পথেই চলা। বাধা বিঘ্নগুলোকে সাফ করে। হ্যাকার কম্যুনিটির কাছেও এটা নতুন কিছুই নয়। কিন্তু তৎকালীন সমাজ, প্রযুক্তি, অর্থনীতির ট্রেন্ডস্ বা গতি-প্রকৃতির তুলনায় এটা ঘুরে দাঁড়ানো তো বটেই। কিন্তু লড়াই কি আলাদা করে প্ল্যান করে বানানো হল? প্রাথমিক রূপরেখা প্রভৃতি প্রভৃতি ঠিক করে নিয়ে কি এগোনো হল? না। আসুন, তবে একটু প্রক্রিয়াটা ঘেঁটে দেখা যাক।

১৯৭৫-৭৬ সাল স্টলম্যান হয়তো তখন ব্যথাতুর নয়নে দেখছেন, সফ্টওয়ার নিয়ে ধুন্ধুমার ব্যবসার প্রসার। কোড ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়া প্রভৃতি প্রভৃতি। হয়তো ভাবছেন নিজেদের অপারেটিং সিস্টেমের কথা। সে সময় তিনি TECO বলে MIT-র একটা সফ্টওয়ার তৈরীর প্রজেক্টে কাজ করছিলেন। TECO হল একটি Text Editor সফ্টওয়ার। কয়েকপাতা টাইপ করে, সেই লেখার নানারকম পরিবর্তন (রঙ, আকার, লেখার স্টাইল, প্রভৃতি) করা যায় যে সফট্ওয়র এর সাহায্যে, তাকে Text Editor সফট্ওয়ার বলে। প্রায় একইসময়ে আমেরিকারই স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের AI গবেষণাগারে প্রায় একইরকম কিন্তু উন্নততর একটি সফ্টওয়ার E বানানো হয়েছিল। E -তে প্রতিটি কি বোর্ড আদেশের সাথে সাথে সফ্টওয়ারটি আদেশ পালন করত এবং ফলশ্রুত (output) লেখা (text)-টি দিয়ে দিত। এই ব্যবস্থাটি স্টলম্যান TECO-তে কাজে লাগালেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই কোডটিকে আরো একটু বিন্যস্ত করলেন। যার ফলে কোনো একাধিক আদেশের সারণীকে একটি মাত্র সূচক চিহ্ন বা একটি মাত্র কি-বোর্ড আদেশ দ্বারা চিহ্নিত করা যাবে এবং এই সূচকগুলি Text Editor-টার স্মৃতিতে রয়ে যাবে। ফলে পরে যে-কোনো সময় ঐ সূচকটিকে ডাকার মাধ্যমে ঐ গোটা আদেশ সারনীটিকেই ডেকে আনা যাবে। এটাকে বলে ম্যাক্রো। কম্পিউটারের, বিশেষতঃ সফ্টওয়ার-এর ইতিহাসে এটা একটা উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। কারণ এর ফলে কোনো একটি সফ্টওয়ার-এর কমান্ড বা আদেশগুলি নিয়ে, তাদের পছন্দমতো বিন্যস্ত করে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য সংযোজন করা যাবে। TECO-তে এই নতুনত্বটি সংযোজিত হল। TECO ব্যবহারকারীরাও এটা জানলো। তারপর দু'বছর ধরে চললো এক অভূতপূর্ব প্রোগ্রাম বিস্ফোরণ। প্রচুর হ্যাকার তাদের ইচ্ছামতো ম্যাক্রো তৈরি করে চললো। এবং একই সাথে চললো শেয়ারিং বা আদান-প্রদান, কোনো একজনের TECO-তে আর একজন যদি কোনো পরিমার্জন করতে চাইতো, তাহলে প্রথমে একটা দীর্ঘ সময় যেত প্রথমজনের ম্যাক্রোগুলোকে বুঝতে। এই অসুবিধা দূর করতে ম্যাক্রো-র স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু হল।

কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বা সর্বজনস্বীকৃত একইরকম ম্যাক্রো তৈরির

একটা মুশকিল ছিল। এতে যে হ্যাকারদের স্বাধীনতা খর্বিত হবে! সমাধান? কেবলমাত্র কতগুলি মৌলিক স্ট্যান্ডার্ড ম্যাক্রো ছাড়া বাকিগুলিতে কোনো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন রইলো না। এই স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনটুকুও স্টলম্যানের করা। নতুন এই এডিটরটির নামকরণ হল, Emacs। এডিট ম্যাক্রোস। কিন্তু যারা নতুনতর কিছু সংযোজন করবে তাদের নতুন সংযোজনের কথা বাকিরা জানবেই বা কী করে আর পাবেই বা কী করে? তার ব্যবস্থাও হল। কোডটি ছেড়ে দেওয়া হল সর্বসাধারণের জন্য। কিন্তু শর্তসাপেক্ষে। "যে কেউ ইম্যাক্স-এর কোড নিয়ে সংযোজন করতেই পারে। কিন্তু সংযোজিত অংশটি যার কাছ থেকে কোড নেওয়া হয়েছে তাকে ফেরত দিতে হবে।" এই ব্যবস্থার ফলে সংযোজনগুলি হাত ঘুরে ঘুরে স্টলম্যানদের কাছে এসে পৌঁছত। স্টলম্যানরা আবার সেগুলিকে পুনঃবিতরণ করে দিতেন। (কোনো কোনো হ্যাকার আবার এই সংযোজন ফেরত দেবার শর্ত মানতেও রাজি ছিল না। তারা সংযোজনসহ ইমাক্সটিকে নতুন সফ্টওয়ার হিশেবে নামকরণ করে দিত। উদাহরণ—EINE (EINE Is Not Emacs)। যদিও এদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হত না কখনও। ইম্যাক্স এইভাবে তার বহর বাড়িয়ে চলল। দ্রুতগতিতে। এক অনিয়ন্ত্রিত, সামুহিক, সমষ্টিগত প্রক্রিয়ায়। স্টলম্যান এর নাম দেন 'ইম্যাক্স কমিউন'।

প্রক্রিয়াটি ঘটল। তারপর এল তার দার্শনিক ব্যাখ্যা। স্টলম্যানের নিজের ভাষায় (১৯৭৯) : "...আগে থেকে লক্ষ্য, নীতি, রীতি ঠিক করে যদি প্রক্রিয়াটির কাজ এগোত, তবে পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকম হত। আগে থেকে ছকে নেওয়া ফলাফলের বাইরে কিছু পাওয়া যেত না। কিন্তু এটি একটি অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। তাই সংযোজনগুলি নতুন নতুন অকল্পনীয় সব সম্ভাবনার জন্ম দিচ্ছে।" GNU অপারেটিং সিস্টেম তৈরির মহতী উদ্যোগের প্রাক্‌লগ্নে ইম্যাক্স কমিউন-এর অভিজ্ঞতা স্টলম্যানকে যেন শিখিয়ে দিয়ে গেল কী করতে হবে!

[ক্রমশ]

বিশ্ব সামাজিক মঞ্চের আলোচনায় নারীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ

বিশ্বজিৎ রায়

এক

পশ্চিমি 'মুক্তি' এবং মৌলবাদী অনুশাসন—এই দুইয়ের মধ্যে দ্বৈরথে পদপিষ্ট নারী কীভাবে রুখে দাঁড়াবেন? সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতা, দেশ-কাল-সমাজ-সময়ের নির্দিষ্টতা বা স্থানীয়তাকে মূল্য দিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়বেন তিনি? না তার লড়াই হবে বিশ্বজনীন, সেকুলার, নারীবাদী অবস্থান থেকে? সাম্প্রদায়িক হানাহানিরও সবচেয়ে বড়ো শিকার নারী। কিন্তু গুজরাতের অভিজ্ঞতা শেখালো সাম্প্রদায়িক রাজনীতি-সংস্কৃতি এবং হননযজ্ঞের উৎসাহী শরিকও নারী। সে নিজ সম্প্রদায়ের রক্তোন্মাদ, ধর্ষণ-অভিলাষী লুঠেরা পুরুষকে নৃশংসতম হিংসায় মদত দেয়। তাহলে কি ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-ভাষা-দেশ নির্বিশেষে নারীর লৈঙ্গিক সহমর্মিতার ধারণা ভিত্তিহীন? এইসব প্রশ্ন এবারের মুম্বই বিশ্ব সামাজিক মঞ্চের (ওয়ার্ল্ড সোস্যাল ফোরাম) সমাবেশে আয়োজিত কয়েকটি আলোচনাচক্রে উঠে এসেছে।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, জিয়নবাদী ইজরায়েলি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্যালেস্তাইনি তথা আরবদের রক্তাক্ত লড়াই যখন দুপক্ষের মৌলবাদী চরমপন্থীদের রাজনৈতিক ও নৈতিক সক্ষমতা এবং প্রভুত্বকে সংহত করার পরিবেশ গড়ে তুলেছে, তখন আরব-ইহুদি মেয়েদের-মায়েদের অবস্থান কী হওয়া উচিত? ঘরের কাছে গুজরাতে হিন্দু-মুসলমান নারীর যৌথ কোনও সহমর্মী তৎপরতার ভাবনা কি আজকের পরিস্থিতিতে সেরেফ ভাবের ঘরে চুরি? যে ধর্ম, ধর্মীয় ঐতিহ্য ও অনুশাসনের নিগড়ে নারীর ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা বন্দি, তারই অনুষঙ্গে এবং আধারে নির্মিত পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভিত্তিতেই এই পারস্পরিক কথোপকথন সম্ভব? নারীর প্রশ্ন ছাড়িয়ে, গোটা সমাজেই কি লোকায়ত ধর্মীয় সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি-নৈতিকতা দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করা উচিত? না কি তা নেহাতই প্রতীকবাদী, ভোটবাজ রাজনীতির বুলিসর্বস্ব সাম্প্রদায়িক সংহতির চেনা ছকে বন্দি? সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী পশ্চিমি ধ্যানধারণার সঙ্গে সংঘাতে জেরে উদ্ভূত এহেন নানা প্রশ্ন আগোছালোভাবে হলেও উঠে এসেছে বিভিন্ন আলোচনায়। সব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, তিন ঘন্টার সেমিনারে তা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ডবল্যুএসএফ-এর ধরনধারণ মোতাবেক অভিজ্ঞতা ও মতামতের আদানপ্রদানেই ঝোঁক ছিল বেশি। ফলে নানা দেশের নানা মতের (এবং সামাজিক ভিত্তির) তৃণমূলকর্মী, গবেষক, তাত্ত্বিকদের আলোচনা অনেকটা ছড়িয়ে গিয়েছে। তবু আমরা আমাদের প্রতিবেদনে একটি সামগ্রিক ছবি রাখার চেষ্টা করব যাতে একটি কোলাজ বা মন্তাজ ফুটে ওঠে।

সাম্রাজ্যবাদ কীভাবে নারীবাদকে ব্যবহার করছে। এ প্রসঙ্গে ১৮ জানুয়ারি মূল মঞ্চে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে বললেন ইজিপ্টের বর্ষীয়সী নেত্রী নওয়াল এল সাদাউই, ভারতের অরুন্ধতী রায়, তিস্তা শীতলবাদ, আফগানিস্তানের লড়াকু নারী সংগঠন রাওয়া'র তরুণী প্রতিনিধি সাহার সাবা প্রমুখ। অরুন্ধতী শুরুই করলেন তার অ-অনুকরণীয় তীব্র ব্যঙ্গের ঝলকে। "বুশ-ব্লেয়ারই দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বড়ো নারীবাদী। আফগানিস্তানে তালিবান বিরোধী অভিযানে বোরখা-মুক্তি বিপ্লব ছিল দুই স্যাঙাতের অন্যতম অজুহাত। ইরাকে সেটার সুযোগ ছিল না। কারণ সাদ্দামের অতি বড়ো শত্তুরও বলবে সেখানে তার জমানায় মেয়েরা ছিল তুলনায় অনেক স্বাধীন। কিন্তু সাদ্দামের ধড়ে লাদেনের মাথা ইমপোজ ক'রে যে কিম্ভুত দৈত্যটি নির্মিত হয় তাতে আমেরিকান-বৃটিশ মেয়েদের ভয় ও ঘৃণা উৎপাদন ছিল স্বাভাবিক। এভাবেই নারীবাদের এক অধঃপতিত রূপকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ।" অরুন্ধতীর এই কথার আগেই 'উত্তর ঔপনিবেশিক পণ্যবাদী 'বোরখা' সম্পর্কে সাবধান করেন সাদাউই। "আরব তথা মুসলমান মেয়েরা মৌলবাদীদের অনুশাসন ভেঙে বোরখা সরিয়ে রাখছে। কিন্তু পশ্চিমি সংস্কৃতির ধারাবাহিক আগ্রাসনের চাপে তারা শরীরে তুলে নিচ্ছে আর একটি অদৃশ্য বোরখা। উত্তর ঔপনিবেশিক পণ্যবাদী বোরখা। লিপস্টিক, মেক-আপ, জিনস, বার্বি ডল প্রতিম নিতম্ব-কটি-বক্ষসম্পদ তাকে মাল্টিন্যাশনাল কসমেটিক্স কোম্পানি, আর বিউটি কনটেস্টের পুতুলে পরিণত করেছে। স্বাধীন নারীর যে মূর্তি তারা শরীরে-মনে গড়ে তুলছে তার ছাঁচটা আসলে আসছে মাল্টিন্যাশনালদের কারখানা থেকে।"

তাহলে কী সাদাউই বা অরুন্ধতী ঐতিহ্যবাদী মৌলবাদীদের সঙ্গে আপসের পক্ষে? অরুন্ধতীকে আমরা জানি, সাদাউই সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাচ্ছি যাতে আরব নারীবাদীদের ঘরানাটাকে চেনা যায়। এ বিষয়ে একটি লেখায় (মান্থলি রিভিউ ২০০২ মার্চ, এস এম দরাজ) তাকে পশ্চিমে সবচেয়ে পরিচিত আরব নারীবাদী হিশেবে উল্লেখ করেন। ইসলামের সমালোচনা করায় ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে তাঁর ৩৪ বছরের বিবাহিত

মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলন [২]

শমীক সরকার

কম্পিউটার আসলে অনেক বিদ্যুৎ-প্রবাহীর জটিল সজ্জা। সেগুলির কোনগুলি দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ হবে এবং কতক্ষণ ধরে হবে, এই আজ্ঞা মানুষের কাছ থেকে না পেলে সে না পারে সচল হতে, না পারে কাজ করতে। এই নির্দেশগুলি লেখার জন্য প্রয়োজন হয় ভাষার। সেই ভাষাগুলিতে (যেমন সি, পাস্কাল প্রভৃতি) লেখা নির্দেশতন্ত্র (পরিভাষায়, প্রোগ্রাম বা কোড) প্রথমের দিকে মূলতঃ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতেই তৈরি হতো। এই নির্দেশতন্ত্র লেখার জন্য যথেষ্ট মুন্সিয়ানা প্রয়োজন হতো। যারা এই কোড লিখত, তারা পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করে নিয়েছিল কাজটার দ্রুত অগ্রগতি এবং নিজেদের পরিশ্রম লাঘবের জন্যই। কোড আদান-প্রদান এর একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। ক্রমে সফ্‌টওয়ার নিয়ে বাণিজ্য গড়ে ওঠে বিশ্বজোড়া। ফলে এই কোড আদান-প্রদানের বাতাবরণ ভেঙে যেতে থাকে। কোড-এর কপিরাইটের মাধ্যমে কম্পিউটার জগতের বৈধতা, মূল্যবোধ পুনঃসংজ্ঞায়িত হয়। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনও শুরু হয় প্রায় সাথে সাথেই। কার্যকর, প্রযুক্তিক আন্দোলন, তারই প্রথম অভিজ্ঞতা 'ইম্যাক্স কমিউন'। মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় প্রথম অংশটি ছাপা হয়েছিল, শেষাংশ এবারে ছাপা হল।

প্রথমতঃ ইম্যাক্স কমিউন বাণিজ্যিক উন্নয়ন বা পুঁজিবাদী ধাচার উন্নয়নের বিপরীতে সহযোগিতামূলক গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নয়নের এক মডেল হাজির করে। দেখা যায়, সহযোগিতামূলক গণ-উদ্যোগের উন্নয়ণের জোর বেশি। তা পুঁজিবাদী ধাচার উন্নয়নের তুলনায় অতি কম সময়ে বিপুলায়তন ফলদায়ী। এতে ভুল বা ফাঁক-ফোঁকরও অনেক কম। প্রযুক্তিগত দিক থেকেও এটা উন্নততর। এবং এগুলো অনেক বেশি উন্মুক্ত সৃষ্টি— যে কোনো প্রোগ্রামার, এমন কি সাধারণ ব্যবহারকারীও একে ইচ্ছেমতো পরিবর্তন করে নিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ইম্যাক্স কমিউন এর সাফল্য 'ঘুরে দাঁড়াবার আন্দোলন'কে গঠনমূলক পথে এগোতে উৎসাহ এবং আত্মবিশ্বাস জোগায়। আরো কয়েকবছর পরে ১৯৮১-৮২-তে যখন MIT-র AI ল্যাবেরই প্রায় সমস্ত হ্যাকার বিকিয়ে যাচ্ছে একের পর এক সফ্‌টওয়ার কোম্পানিগুলির কাছে, তখন, নির্বান্ধব, হতাশ, নিজের কৌমের ধ্বংস প্রত্যক্ষকারী স্টলম্যানের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, তাঁর নিজের বর্ণনা অনুসারেই। প্রথমটি হল, ব্যক্তিমালিকানাধীন সফ্‌টওয়ারগুলির 'লাইসেন্স' আপন প্রতিভাবলে ভেঙে দিয়ে এবং গোপন রাখা কোড উদ্ধার করে সেগুলির কপি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বিলি করা। আরেকটি হল, নিজেদের প্রচেষ্টায় একটি পূর্ণাঙ্গ সফ্‌টওয়ার অপারেটিং সিস্টেম বানানোর কঠিন, অনিশ্চিত পথে ব্রতী হওয়া—রিক্ত প্রেক্ষাপটে নিজেদের দাঁড়ানোর জায়গা বানিয়ে নেওয়া। আন্দোলন বেছে নিয়েছিল দ্বিতীয় পথটি। ইম্যাক্স এর সাফল্য অনেক 'শ্রমিক' প্রোগ্রামারকেও উৎসাহিত করেছিল।

তৃতীয়তঃ ইম্যাক্স কমিউনের কিছু সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়েছিল। এই কমিউন দাঁড়িয়েছিল 'হ্যাকার এথিক্স', 'পারস্পরিক বোঝাপড়া', অস্পষ্ট লাইসেন্স প্রভৃতি 'ইনফর্মালিটি' গুলোর উপর। এরই ফাঁক গলে ইম্যাক্স-এর কিছু উন্নততর ভারমানকে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করে কিছু কোম্পানি। আবার এই 'ইনফর্মালিটি' কমিউনের কুশীলবদের মধ্যে আদর্শনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটাতেও অক্ষম ছিল। তাই তাদেরই বেশির ভাগ কয়েকবছরের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যান সফ্‌টওয়ার কোম্পানিগুলির কাছে। এইসব সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার তাগিদ নিয়েই ১৯৪৫ সালে তৈরি হয় 'GNU ইস্তাহার'। আন্দোলনের রাজনৈতিক দার্শনিক প্রচারপত্র। তৈরি হয় GNU GPL।

GNU জেনারেল পাবলিক লাইসেন্স (GNU GPL)

নতুন এবং 'মুক্ত' সফ্‌টওয়ার-এর 'মুক্ততা'-কে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, অস্পষ্ট ইম্যাক্স লাইসেন্স এর বদলে একটি নতুন ধরনের 'লাইসেন্স' বা শর্ত-র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হচ্ছিল ইম্যাক্স অভিজ্ঞতার পর থেকেই। এই নতুন শর্তের নামই GPL, এই আন্দোলনের একটি হাতিয়ার। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আমার মতে, এটা শুধু ঐ আন্দোলনের হাতিয়ার নয়, গোটা পৃথিবীর পুঁজিবাদ-বিরোধী মানুষের কাছে একটি নতুন ভাবনার খোরাক। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। প্রথমে GPL সম্পর্কে ভালভাবে জানা যাক। এটা আমি নিজের বয়ানে লিখব না। অনুবাদ করব স্টলম্যানের নিজের লেখার সংগ্রহ থেকে।

GNU জেনারেল পাবলিক লাইসেন্স, ভারসান ২, ১৯৯১ : ভূমিকা : বেশীরভাগ সফ্‌টওয়ার এর লাইসেন্স এমনভাবেই বানানো, যাতে আপনারা সেই সফ্‌টওয়ারটিতে কোনো পরিবর্তন করতে না পারেন বা অন্য কারো সাথে শেয়ার করতে না পারেন। ঠিক বিপরীতে, GNU জেনারেল পাবলিক লাইসেন্স এর কাজ আপনার মুক্ত সফ্‌টওয়ার শেয়ার করার এবং পরিবর্তন করার স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা, সমস্ত ব্যবহারকারীর কাছে সফ্‌টওয়ারটির মুক্ততাকে সুনিশ্চিত করা। ...আপনিও আপনার তৈরি প্রোগ্রামে এই লাইসেন্স ব্যবহার করতে পারেন।

আমরা যখন 'ফ্রি' সফ্‌টওয়ার নিয়ে কথা বলি, তখন আমরা [ফ্রি বলতে] 'মুক্তি' বা 'স্বাধীনতা'-র কথা বলি, পয়সার দিক থেকে কথাটি বলি না। আমাদের GPL এমনভাবেই বানানো যা আপনার 'মুক্ত' সফ্‌টওয়ার -এর কপি বিতরণ (এবং যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে এই বিতরণের পারিশ্রমিক নেওয়া) করা, চাইলেই বা না চাইতেই যাতে আপনি কোডটাও পেতে পারেন, সফ্‌টওয়ারটিকে পরিবর্তন করতে পারেন বা এর কোনো অংশকে আপনি আপনার কোনো নতুন মুক্ত প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে পারেন, এসব স্বাধীনতাগুলিকে সুরক্ষিত করে। আর হ্যাঁ, আপনার যে এসব স্বাধীনতাগুলি আছে, তা জানাটাও সুনিশ্চিত করে।

আপনার এসব অধিকারগুলি সুরক্ষিত করার জন্যই আমাদের কিছু বিধিনিষেধের প্রয়োজন হচ্ছে। যার ফলে, কেউ যদি আপনাকে এই অধিকারগুলি দিতে অস্বীকার করে বা ছেড়ে দিতে বলে, সে বাধা পাবে। এই বিধিনিষেধগুলি আসলে আপনার উপর চাপানো কিছু দায়িত্ব। যদি আপনি সফ্‌টওয়ারটির কপি বিতরণ করেন বা সফ্‌টওয়ারটিতে কিছু পরিবর্তন করেন, তবে এই দায়িত্ব আপনার উপরও বর্তাবে।

যেমন ধরুন, আপনি একটি সফ্‌টওয়ার-এর কপি বিতরণ করছেন, বিনে পয়সায় বা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। তাহলে, সফ্‌টওয়ারটি যে বা যারা পেল, তাদেরকেও আপনার সমতুল্য অধিকার দিতে আপনি বাধ্য থাকবেন। তারা যাতে চাইলেই বা এমনিতেই কোডটাও পেয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে। এবং এই শর্তগুলি আপনাকে তাদের দেখাতেই হবে, যাতে তারাও তাদের অধিকারগুলি [এবং দায়িত্ব] সম্পর্কে সজাগ হয়।

দুটি ধাপে আমরা আপনার অধিকার সুরক্ষিত করি।

১। সফ্‌টওয়ারটির কপিরাইট নিয়ে নেওয়া ; এবং

আপনাকে লাইসেন্স দেওয়া যে আপনি সফ্‌টওয়ারটির কপি বা বিতরণ বা পরিবর্তন-এর আইনি স্বীকৃতি পেলেন।

GNU GPL-এর একটি নমুনা দেখতে চান?

"© এই সফ্‌টওয়ার / প্রোগ্রামটি সম্পূর্ণত বা অংশতঃ যে কেউ স্বাধীনভাবে কপি বা বিতরণ বা পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করতে বা নতুন কোনো প্রোগ্রামে পুনঃব্যবহার করতে পারে এই শর্তে, যে, পরিবর্তিত বা বিতরিত কপিতে বা নতুন প্রোগ্রামটিতে কপিরাইট নোটিসে এই বক্তব্যটিই থাকতে হবে।"

অনেকে এটাকে বলেন, 'হ্যাকারদের সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যাংড়ামি'। কেউ বলেন, 'সর্বোত্তম হ্যাকারপনা'।

আসলে এটি একটি আদর্শবোধের বাস্তব প্রয়োগ। প্রাগমাটিক আইডিয়ালিজম। প্রোগ্রাম বা কোড বা সফ্‌টওয়ার-এর ব্যক্তি মালিকানার অবসান চাই— এটাই সেই আদর্শবোধ। বিবর্তনটির দিকে নজর দিলে দেখা যায়, প্রথম ধাপে প্রোগ্রাম বা কোড বা সফটওয়ার-এর ব্যক্তিমালিকানা ছিল। কিন্তু সফ্‌টওয়ার-এর বহুল ব্যবহার ছিলনা। তাই সফট্‌ওয়র নিয়ে বাণিজ্যও ছিল না। তারপর সফ্‌টওয়ার, কোড নিয়ে ব্যবসা শুরু হল। সহযোগিতার ধারণা, আদান-প্রদানের স্বাধীনতার মৃত্যু হচ্ছিল। তাই, 'মুক্তি'-র জন্য প্রয়োজন ছিল সফ্‌টওয়ার, কোড প্রভৃতির ব্যক্তিমালিকানা অবসানের, লাভজনকতার অবসানের। এল মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনের প্রকল্প। হয়ত প্রথমে ভুল বললাম। আদর্শবোধটি ব্যক্তিমালিকানার অবসান নয়। আর্দশবোধটি হল সহযোগিতার, স্বাধীনতার, শেয়ারিং-এর। আর তার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিমালিকানা থেকে মুক্তি। আর প্রকল্পটি, মানে আন্দোলনটি একটি বাস্তব ঘটনা। বাস্তব পথচলা, গতিশীল। তাই প্রয়োজন হয় পদ্ধতির। সেই পদ্ধতির নামই GNU GPL. চলতি ভাষায় 'কপিলেফ্‌ট'। এই পদ্ধতি প্রয়োগের মূল হাতিয়ার কী? ব্যক্তিমালিকানাকে সুরক্ষা প্রদান করে এক ঐতিহাসিক অস্ত্র —'কপিরাইট'। গোটা আইনব্যবস্থাটাই যখন ব্যক্তিমালিকানার সুরক্ষাভিত্তিক তখন আইনি হাতিয়ার যদি নিতেই হয়, তাদের মধ্যে থেকেই সুবিধেজনক একটা না নিয়ে উপায় কি? যাই হোক, এখন থেকে বাণিজ্যায়নের পক্ষে যারা, তারা কপিরাইটকে কপিরাইট হিশেবেই ব্যবহার করবে। আর বিপক্ষে যারা, কপিলেফ্‌ট হিশেবে।

প্রসঙ্গতঃ GPL এর অনেকগুলি 'ভারসান' আছে। কিছু ভারসান বই বা কোনো লেখার জন্যও প্রাসঙ্গিক। আসলে GPL প্রবহমান জ্ঞানের উত্তরাধিকার, মেধাস্বত্ত্ব বা Intellectual Property Rights প্রভৃতি বিষয়ে একটি ভাবনা-চিন্তার প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটায়। সে প্রসঙ্গে আমরা শেষে আসছি।

GNU GPL প্রসঙ্গে শেষ যে কথাটা বলা উচিত, সেটা হল, ১৯৭৬-৭৯-এর ইম্যাক্স-এর লাইসেন্সিং প্রথার মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা একটা পরিপূর্ণ পদ্ধতি এবং রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে GNU GPL এর মধ্যে দিয়ে। এত স্পষ্টতর লাইসেন্স-এর আগে অনেক অস্পষ্ট লাইসেন্স চালু ছিল। ইম্যাক্স ছাড়াও এই ধরনের অস্পষ্ট লাইসেন্সের আর একটি উদাহরণ :

"© যে কেউ প্রোগ্রামটি কপি করতে, পরিবর্তন করতে বা বিতরণ করতে পারেন, যদি তা পয়সা কামানো-র উদ্দেশ্যে বা প্রোগ্রামটি নিজের নামে চালিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে না হয়।"

এই লাইসেন্সের আবিষ্কর্তা ল্যারি ওয়াল। একজন প্রথিতযশা হ্যাকার। এছাড়াও আরো নানা ধরনের লাইসেন্স-এর উদাহরণ আছে। যেমন আমেরিকার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কম্পিউটার গবেষণা গোষ্ঠি' (CSRG)-র তৈরি করা আর একটি লাইসেন্স অনুযায়ী কেউ যদি প্রোগ্রাম-এর কপি কিছু টাকা দিয়ে কেনেন, তবে তিনি তারপর ঐ সফ্‌টওয়ার এবং কোড নিয়ে 'যা খুশি তাই' করার অধিকার পেলেন। এদের তৈরি একটি মুক্ত অপারেটিং সিস্টেম হল ফ্রি বি এস ডি (Free BSD)।

GNU GPL-এর আইনি স্বীকৃতি প্রাপ্তি ১৯৮৬ সালে। কিন্তু নতুন একটি সফ্‌টওয়ার অপারেটিং সিস্টেম বানাবার জন্য খরচ আছে তো? আসবে কোথা থেকে? মুক্ত সফ্‌টওয়ারগুলো কপি করে ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া বা রক্ষণাবেক্ষণ করার সার্ভিস চার্জ। বা শুভানুধ্যায়ীদের অনুদান। এসবের জন্যই তৈরি হল ফ্রি সফ্‌টওয়ার ফাউন্ডেশন (FSF), ১৯৪৩ সালে। তবে এর প্রধান কাজ অবশ্যই মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনের প্রচার। ফাউন্ডেশন কয়েকজন বোর্ড মেম্বার, একজন চেয়ারম্যান এবং একজন হিশেবরক্ষক নিয়ে তৈরি হয়েছিল, আমেরিকায়। চেয়ারম্যান রিচার্ড স্টলম্যান।

১৯৮৪ সালে স্টলম্যান MIT-র চাকরি ছেড়েছেন। যাতে MIT এই নতুন অপারেটিং সিস্টেমের কোনো স্বত্ব দাবি করতে না পারে।

প্রায় একই সাথে এবং প্রায় একইরকম আর একটি মুক্ত অপারেটিং সিস্টেমের উদ্যোগ নিয়েছিল বার্ক্‌লের কম্পিউটার বিজ্ঞানীরা—আগেই জেনেছি আমরা। মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনে এঁদেরও প্রচুর অবদান। পরে কোনোদিন সময় পেলে এদের কার্যকলাপ-বিবর্তন নিয়েও আলোচনা করা যাবে।

১৯৯১ সাল। একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম তৈরির অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছিল তখন। এরই মাঝে তৈরি হয়েছে GCC, GDB প্রভৃতি অত্যন্ত উন্নতমানের মুক্ত সফ্‌টওয়ার, FSF এর উদ্যোগে। কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম-এর শাঁস বা কার্নেলটি তখনো তৈরি করা যায়নি ভালভাবে। ইউনিক্স-এর কার্নেলের কিছু পরিবর্তিত রূপ বা ভারসান দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু ফলাফল খুব একটা ভাল নয়। প্রসঙ্গতঃ কারনেল বা শাঁস হল অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটা অংশ যা মেশিনের হার্ডওয়ার-এর প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে সফ্‌টওয়ার সামনে উন্মুক্ত করে।

১৯৯১ সালে ফিনল্যান্ড-এর হেলসিংকির এক বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ২১ বছর বয়সী লিনাস তোরভাল্ডস একটা কারনেল লিখে ফেললেন। তাঁর নিজের ভাষায় শুধুমাত্র মজার জন্যই। কারনেলটির প্রথম দুটি অসম্পূর্ণ ভারসান-এর কোনো লাইসেন্স ছিলনা। তারপর, তৃতীয় ভারসান থেকে GPL লাগিয়ে দেন লিনাস। তারপর থেকে শুরু হল লিনাক্স কারনেল উন্নয়নের জন্য একটি গোষ্ঠী উদ্যোগ। স্টলম্যানদের উদ্যোগ থেকে এ উদ্যোগ সম্পূর্ণ পৃথক। GNU-র যাবতীয় কাজ এবং লিনাস এর কারনেল (যার নাম লিনাক্স) জুড়ে দিয়ে তৈরি হল অপারেটিং সিস্টেম GNU/Linux, যার পরিচিত নাম লিনাক্স। এটি একটি ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম।

ইন্টারনেট নামক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা বিশ্বের কত লোক যে এখনো নীরবে বা সরবে, জানিয়ে বা না জানিয়ে এই অপারেটিং সিস্টেমকে উন্নততর করে চলেছেন, তার কোনো হিশেব নেই। আইবিএম প্রভৃতি শিল্পসংস্থা বাধ্য হয়ে তাদের নতুন সফ্‌টওয়ারগুলির অনেকগুলিকে মুক্ত সফ্‌টওয়ার করে দিয়েছে। কারণ, সেগুলির বেশ কিছু কোড মুক্ত কোড থেকে ধার নেওয়া, যেগুলিতে GPL আছে। GNU/LINUX অপারেটিং সিস্টেমকে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া, সার্ভিসিং বা মেইনটেনেন্স নিয়ে এখন চলছে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। রেড হ্যাট, সুজে, ম্যানড্রেক প্রভৃতি এরকমই কিছু ভেন্ডরের নাম। আবার নন্‌-প্রফিট কিছু ভেন্ডরও আছে। যেমন ডেবিয়ান। প্রযুক্তিগত গুণমানে গ্নু/লিনাক্স চিরকালই এগিয়ে

যে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানার অপারেটিং সিস্টেমের চেয়ে। এখন তা ব্যবহারকারীর পক্ষেও সুবিধেজনক হয়ে উঠছে।

মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনে ভাঙনও হয়েছে। ইতিমধ্যেই। ইম্যাক্স কমিউনের প্রথম শিক্ষার কথা মনে করুন। 'সহযোগিতামূলক গণ-উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নয়ন'। মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছে মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলন মানে হয়ে দাঁড়ায় এটাই। আর কিছু নয়। মুক্তি, স্বাধীনতা, অন্ততঃ সফ্‌টওয়ার-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার অবসান— প্রভৃতি প্রভৃতি যে যে আদর্শনৈতিক ধ্যান-ধারনা এই আন্দোলনের সাথে একদম শুরুর থেকে সম্পৃক্ত, সেগুলির দায় নিতে নারাজ এই অংশটি। অন্ততঃ তাদের কথাবার্তা শুনে তাই মনে হয়। GPL ব্যবহারেরও পক্ষপাতী নয় তাঁরা। বরং বার্কলের তৈরি লাইসেন্সের দিকে তাঁদের ঝোঁক বেশি। মুক্ত সফ্‌টওয়ার বা ফ্রি সফ্‌টওয়ার নামটির পরিবর্তে তাকে ওপেন সোর্স সফ্‌টওয়ার অর্থাৎ, যে সফ্‌টওয়ার-এর কোড চাইলেই বা না চাইতেই পাওয়া যায়, এই নামে ডাকতে চায় তাঁরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজনের নাম এরিক এস. রেমন্ড। অত্যন্ত প্রতিভাবান হ্যাকার। আদতে ইম্যাক্স কমিউনের লোক। এই সব বিষয় নিয়ে তাঁর লেখা একটি ছোট্ট বই আছে। দি ক্যাথিড্রাল অ্যান্ড দি বাজার। এই ভাঙনটি বৈধতা পায় ১৯৯৮ সালে। আন্দোলনের দুটি ধারার কর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন? স্টলম্যান, যিনি মুক্ত সফ্‌টওয়ার ধারার লোক, তাঁর কথায়— 'এই ভাঙনটি দেখতে সত্তরের দশকের র‍্যাডিক্যাল গ্রুপগুলির ভাঙনের মতোই। পার্থক্য শুধু এখানে, যে, সত্তর দশকের গ্রুপগুলির লক্ষ্য ছিল একই, কিন্তু তারা একসাথে কাজ করতো না। আর আমরা লক্ষ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কিন্তু অনেক কাজই একসাথে করি। হ্যাঁ, আমাদের দু-তরফেরই শত্রু একই— ব্যক্তিমালিকানাধীন বা প্রোপাইটারি সফ্‌টওয়ার।

আসলে, লিনাক্স কারনেল-এর ডেভেলপার FSM-এর লোকজনের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য প্রথম থেকেই ছিল। এরিক রেমন্ডরা আদতে FSM-এর লোক। কিন্তু পরে তারা 'লিনাক্স কমিউনিটি'-র সাথে ঐক্য স্থাপন করেন। GNU-এর লোকেদের, বিশেষতঃ স্টলম্যানের সফ্‌টওয়ার তৈরির 'মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট' স্টাইল,নিজেদের বৌদ্ধিক দক্ষতার উপর অত্যধিক নির্ভরতা, এতটা 'সুপরিকল্পিত অন্তর্ঘাত' রেমন্ডদের অপছন্দ ছিল। তুলনায় লিনাক্স কারনেল ডেভেলপারদের ইনফরম্যাল, ইন্টারনেট-নির্ভর ধরনটা অনেক বেশি পছন্দ ছিল। একথা ঠিক রেমন্ডদের মতামত হয়তো আদর্শনৈতিকভাবে অতটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু একচেটিয়া ব্যক্তিমালিকানাধীন সফ্‌টওয়ার-এর বিরোধিতার এই দুই ধারা, তাদের মধ্যে বিতর্ক— পুরোটাই গভীর অভিনিবেশ দাবি করে।

মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনের গল্প মোটামুটি এটুকুই। কিন্তু মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনের দার্শনিক প্রভাব আরো আরো অনেক সুদূরপ্রসারী। জ্ঞান, মানবিক জ্ঞানজ সম্পদ সম্পত্তি কি না — এই বিতর্ক বহুদিনের। আইজ্যাক নিউটন যদি তাঁর তিনটি গতিসূত্রের উপর পেটেন্ট নিয়ে বলতেন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে এই তিনটি সূত্র কেউ ব্যবহার করতে পারবে না, তবে কি হত ভাবতে পারছেন? এই বিতর্কে একটি নতুন দিক এই আন্দোলন। জ্ঞানজ সম্পদকে যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রতিষ্ঠানগত সম্পত্তি বা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায় তাদের হাত এড়ানোর আন্দোলন এটা। তাইতো GPL-এর আজ সফ্‌টওয়ার ক্ষেত্রের বাইরেও বহুল ব্যবহার। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। লিখিত জ্ঞানের ক্ষুদ্র সীমার বাইরে যে বিশাল সামাজিক জ্ঞানের জগৎ (যার উৎপত্তি সাধারণ মানুষের জীবন-সংগ্রামের মধ্যে, যার প্রবহমানতা মুখে মুখে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষীকৃত), পুঁজির স্বার্থে, মুনাফার স্বার্থে তার ব্যবহারকে আটকাতে অনেকেই এই ক্ষেত্রেও GPL ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবছেন।

তবে আমার মনে হয় GPL বা এই আন্দোলনের পরিধি শুধু 'জ্ঞানজ সম্পদ' এর মধ্যেই আটকে থাকে না। প্রকৃত পক্ষে 'জ্ঞান'কে বা 'মেধা'কে যদি আমরা ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির 'বৌদ্ধিক স্ফুরণ' হিশেবে না দেখি, কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিশেবে না দেখি, যদি আমরা এটাকেও একটি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত হিশেবে দেখি, তাহলেই মনে হয় ঠিক দেখা হয়। তিনটি গতিসূত্র মানে কি শুধু নিউটন? না কি তা ঐতিহাসিকভাবে লিখিত এবং অলিখিত জ্ঞানের সচলতা, ধারাবাহিকতার যে বিপুল সম্ভার এবং নিউটন? তাই 'জ্ঞান' বা 'মেধা' সম্ভবত 'কর্ম'-র থেকে বেশি আর কিছু নয়। 'মেধাবী'-কে আমরা বড়জোর গড়ের চেয়ে বেশি কর্মদক্ষ বলতে পারি। তাই 'মেধা সম্পদ' বা 'জ্ঞানজ সম্পদ'ও আসলে 'পুরাতন কর্ম' বা 'মৃত শ্রম'-এর চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। আমরা 'লিখিত জ্ঞান'-এর জগতের মানুষরা নিজেদের পিঠ চাপড়ানোর জন্যই হয়তো 'জ্ঞানজ সম্পদ'-কে পৃথকভাবে মর্যাদার সঙ্গে বিশেষীকৃত করি।

এবার তাহলে "জ্ঞানজ সম্পদ আসলে মৃত শ্রম ভিন্ন অন্য কিছু নয়" —এইখান থেকে শুরু করা যাক। তাহলেই GPL বা এই আন্দোলনের দার্শনিক প্রভাবের মধ্যে চলে আসতে পারে যাবতীয় 'মৃত শ্রম' — ধান ঝাড়াই মেশিন থেকে চাষযোগ্য জমি, একটা বয়লার থেকে শুরু করে একটা বাড়ি, মায় যেকোনো ভোগ্যবস্তু—সবই। হ্যাঁ, তবে জ্ঞানজ সম্পদ Consumables নয়। বড় পার্থক্য। সুধীজনেরা, সমাজবন্ধুরা এ নিয়ে ভাবতে পারেন। মিলিয়ে এক করে হয়তো দেখা যায়না, তবুও ভাবনাচিন্তায় এই প্রায় মিলে যাওয়াটা নিয়ে এলে লাভ বই ক্ষতি হবে না বোধহয়।

পাশাপাশি আরেকটি জিনিসও মনোযোগ আকর্ষণ করে। রেডহ্যাট, আইবিএম প্রভৃতি কোম্পানীর লিনাক্স নিয়ে ব্যবসা। মুক্ত সফ্‌টওয়ার আন্দোলনের 'কম্যুনিটি ওনারশিপ' বা কৌম-র মালিকানার ধারণার মধ্যেও ঢুকে গেছে পুঁজি সম্পর্ক। বাস্তবতঃ সেখানে চলছে একটা লড়াই, টানাপোড়েন। এই টানাপোড়েনের খানিকটা আঁচ পাওয়া গেল মুক্ত সফ্‌টওয়ার বনাম 'ওপেন সোর্স' সফ্‌টওয়ার-এ, রিচার্ড স্টলম্যান বনাম এরিক রেমন্ড-লিনাস তোরভাল্ডস-এ। কিন্তু গোটা নয়ের দশক এবং নতুন শতাব্দীর প্রথম ক'টি বছরে এই টানাপোড়েন, তার বিচিত্র বিভঙ্গ, স্বল্পস্থায়ী জয়-পরাজয়—এ সবই খুব সংক্ষেপে বলার বিষয় নয়, বিষয়টির গভীরতার সাথে মানানসইও নয়। তাই, এবারের মতো এটুকুই থাক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

'পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে' কালেকটিভ-এর সমস্ত বন্ধুরা, বিশেষত; আসিফ ইকবাল।

সহায়তা :

১। *'ফ্রি অ্যাজ ইন ফ্রিডম', স্যাম ইউলিয়ামস্ এর লেখা রিচার্ড স্টলম্যানের জীবনী।*

২। *www.fsf.org.*

৩। *প্রজাশক্তি প্রকাশনী থেকে বের করা মুক্ত সফ্‌টওয়ার-এর উপরে লেখা রিচার্ড স্টলম্যানের বই।*

৪। *'গ্নু-লিনাক্স ইশকুল', ত্রিদিব সেনগুপ্ত (প্রকাশিতব্য)।*
